ইসতিগফার

অনুপম ক্ষমার হাতছানি

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরীল

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

বিষয়সূচি

লেখকের জীবনী.....৭

জন্ম ও বেড়ে ওঠা.....৭

তাঁর শিক্ষকগণ ও পড়াশোনা.....৮

তাঁর লেখনী.....৯

কারাবাস ও বিচার.....৯

কারাগারের অবস্থা.....১০

তাঁর প্রশংসায় আলিমগণ.....১১

ভূমিকা.....১২

ইসতিগফারের কারণসমূহ.....১৪

১. মানুষের সহজাত ঘাটতি.....১৪

২. আমলের ঘাটতি.....১৫

৩. বাহ্যিক পাপ.....১৭

৪. গাফিলতির পাপ.....১৮

৫. অন্তরের রোগ.....১৯

৬. গোপন ও অপ্রকাশ্য গুনাহ.....২১

৭. অজ্ঞাত গুনাহ.....২৩

ইসতিগফারের গুরুত্ব ও ফজিলত.....২৬

ইসতিগফার করা কেন জরুরি.....৩৩

ইসতিগফারের প্রথম কারণ : মানুষের সহজাত ঘাটতি.....৩৭

ইসতিগফারের দ্বিতীয় কারণ : আমলের ঘাটতি.....৪৫

ইসতিগফারের তৃতীয় কারণ : বাহ্যিক পাপ.....৫৪

ইস্তিগফারের চতুর্থ কারণ : অস্তিত্বহীন পাপ.....৬০

অস্তিত্বহীন পাপ কী?.....৬০

অস্তিত্বহীন পাপের ভয়াবহতা.....৬১

স্পষ্ট পাপ ও অস্তিত্বহীন পাপের পার্থক্য.....৬১

সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ.....৬২

ইসতিগফারের পঞ্চম কারণ : অন্তরের রোগ.....৬৯

ইসতিগফারের ষষ্ঠ কারণ : গোপন ও অপ্রকাশ্য গুনাহ.....৭৮

প্রথম উদাহরণ : গোপন ও অপ্রকাশ্য শিরক.....৭৮

দ্বিতীয় উদাহরণ : গোপন আকাঙ্ক্ষা.....৮০

খ্যাতির লাভ-ক্ষতি.....৮২

তৃতীয় উদাহরণ : গুনাহের প্রকারভেদ.....৮৭

ইসতিগফারের সপ্তম কারণ : অজ্ঞাত গুনাহ.....৯০

সাইয়িদুল ইসতিগফার.....৯৩

গুনাহ মুক্তির উপায়.....৯৩

লেখকের জীবনী

শাইখ নাসির আল-ফাহাদ

তিনি হলেন নাসির ইবনু হামাদ ইবনু হুমাইন আল-ফাহাদ, আসাইদাহ থেকে ফারহেদ থেকে, উতায়বাহ থেকে আল-রাওয়াকাহ থেকে, যার পূর্বপুরুষরা আদনান থেকে বানী সাদ বিন বকর বিন হাওয়াযিন গোত্রের সাথে মিলিত হয়। এ গোত্রের অধিবাসীরাই রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে লালনপালন করেছিল। তার মায়ের নাম নুরা আল-গাজিয়া এবং তার বংশ আদ-দাওয়াসির গোত্রে ফিরে যায়।

তার পরিবার বসবাস করত আল-সুওয়াইরে। এটি আল-জুলফি গ্রামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তার পিতা শাইখ হামাদ ইবনু হুমাইন শাইখ আল-আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম রাহিমাহুল্লাহ'র সাথে কাজ করার জন্য রিয়াদে চলে আসেন। তাই তিনিও বাবার সাথে চলে যান এবং তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আঠারো বছর তাঁর সাথেই থাকেন।

জন্ম ও বেড়ে ওঠা

শাইখ নাসির আল-ফাহাদ ১৩৮৮ হিজরির শাওয়াল মাসে রিয়াদে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই তাঁর বেড়ে ওঠা। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে তিনি আল-মালিক সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকৌশলবিদ্যা অধ্যয়ন শুরু করেন। তিনি এখানে অভূতপূর্ব ফলাফল লাভ করেন। তিনি ছিলেন ক্লাসের সেরা ছাত্র। ইঞ্জিনিয়ারিং তৃতীয় বর্ষ পড়ার সময় তিনি এখান থেকে ইস্তফা নেন। এরপর সেখান থেকে ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু সাউদের শারীয়াহ কলেজে স্থানান্তরিত হন। তিনি চব্বিশ বছর বয়সে মাত্র তিন মাসে পুরো কুরআন হিফজ করেন। তিনি যে মুসহাফ থেকে হিফজ করেন সেটির প্রথম পৃষ্ঠায় লিখেছিলেন—

'এটির (কুরআনের) হিফজ সম্পন্ন হলো, সকল প্রশংসা আল্লাহর ও সফলতা তাঁর সাহায্যেই নিহিত। মুস্তফা (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম)-এর হিজরতের ২৯/১১/১৪১২ তারিখ রবিবার আসরে হিফজ সম্পন্ন হলো। শুরু হয়েছিল একই

বছরের রমাদানে। সকল প্রশংসা আল্লাহর যার কল্যাণে এ মহৎ অর্জন সম্ভব হয়েছে।'

তাঁর শিক্ষকগণ ও পড়াশোনা

তিনি কলেজে একদল শিক্ষকের অধীনে অধ্যয়ন করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হচ্ছেন : শাইখ আবদুল আযীয ইবনু আবদুল্লাহ আর-রাজিহি, আবদুল আযীয ইবনু আবদুল্লাহ আলুশ-শাইখ, সালিহ আল-আতরাম, আবদুল্লাহ আর-রুকবান, যাইদ ইবনু ফায়াদ, আহমাদ মাবাদ এবং আরও অনেকে। রাহিমাহুমুল্লাহ।

তিনি ১৪১২ হিজরিতে ক্লাসে প্রথম হয়ে কলেজ থেকে ইযাযাহ লাভ করেন। তাঁকে পুনরায় শরীয়া কলেজ ও উসূল আদ-দ্বীন অধ্যয়নের জন্য অনুরোধ করা হয়। তিনি উসুল আদ-দ্বীন নির্বাচন করেন; যা মূলত আকীদা ও সামসময়িক মতবাদ সংক্রান্ত বিভাগ। তিনি থাইল্যান্ডে (একটি প্রতিষ্ঠানে) উস্তাদ হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। সেখানে তিনি এক জাহমির সাথে বিতর্ক করেন ও তাঁর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করেন। উপস্থিত শ্রোতারা তাঁর প্রশংসা করেন।

তিনি গ্রন্থ সংগ্রহ, অধ্যয়ন ও গবেষণার পেছনে সময় ব্যয় করতেন। তিনি পড়তে খুব ভালোবাসতেন। তাঁর পুত্র (মুসআব ইবনু নাসির আল-ফাহদ) বলেন, "আমি তাঁকে বাসায় কখনো একটা ঘণ্টাও বই ছাড়া দেখিনি, তিনি গাড়িতে ওঠার সময় বই নিয়ে যেতেন এবং ট্রাফিক লাইটের আলোয় পড়তেন। আমি যদি বলি, তিনি দিনে ১৫ ঘণ্টা পড়েন, তবুও তাঁর ওপর মারাত্মক অবিচার করা হবে।"

তিনি শারীয়ার নানা বিভাগ যেমন আকীদা ও এর সম্পর্কিত বিষয়াদি, হাদীস, রিজাল, সকল মাযহাবের ফিকহ, উসুলুল ফিকহ ও ফারাইদে (উত্তরাধিকার) শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন এবং নিজেকে অতুলনীয় প্রমাণ করেছেন। শারীয়াতের বিধান বের করে আনার ও চূড়ান্ত মতামত দেওয়ার ব্যতিক্রমী দক্ষতা রয়েছে তাঁর।

তিনি ইতিহাস ও বংশতত্ত্বের একজন পণ্ডিতও বটে। একবার শাইখ ওয়ালিদ আল-সিনানীকে কিছু বংশবৃত্তান্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়; যেহেতু তিনি বংশতালিকায় অতুলনীয় এক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, "আস'আদীকে জিজ্ঞাসা করুন।" অর্থাৎ, শাইখ নাসির আল-ফাহদকে।

উনার ছেলে বলেন, "ইমাম (মুহাম্মাদ ইবনু সাউদ) বিশ্ববিদ্যালয়ের আকীদার কয়েকজন অধ্যাপক আমাকে বলেছেন, 'তোমার বাবা আমার সহপাঠী (মাস্টার্সের) ছিলেন। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী ছিলেন তিনি। খুব দ্রুত বুঝতে ও মুখস্থ করতে পারতেন। কঠোরতা ব্যতীত তাঁর ব্যাপারে সমালোচনা করার মতো আর কিছু নেই।'"

তিনি আরও বলেন, "আমি শুনেছি যে, আকীদা বিভাগের এক উস্তাদ একদিন তার ছাত্রদের বলেছিলেন: 'আমাদের ডিপার্টমেন্টে একজনের নানা ভুল ধারণা ছিল। কিন্তু নাসির আল-ফাহদ ছাড়া কেউই তার মুখোমুখি হতে পারত না।'"

তাঁর লেখনী

তিনি অসংখ্য গ্রন্থ ও নিবন্ধ রচনা করেছেন। যেমন :

- উসূলু তাফসীরি শাইখিল ইসলাম ইবনি তাইমিয়্যাহ
- উসূলু ফিকহি শাইখিল ইসলাম ইবনি তাইমিয়্যাহ
- ইক্বামাতুল বুরহান আলা উজূবি কাসরিল আওসান
- আত তাহকীক বিমাসআলাতিত তাসফীক
- আররদ্দু আলার রাফিযা ফী ইত্তিহামিহিমুস সাহাবাহ ওয়াআহলিস সুন্নাহ বিতাহরীফিল কুরআনিল কারীম
- খুলাসাতু বা'দ্বি আফকারিশ শাইখ ইউসুফ কারযাবি
- আলফাতাওয়াল হারিয়্যাহ
- আলফীদিউল ইসলামী ওয়াল ফাদ্বাইয়্যাতুল ইসলামিয়্যাহ
- আররদ্দু আলাল কারযাবি
- আলক্বাওয়াদিন
- আয়াতুর রহমান ফী গাযওয়াতি সিবতিমবার
- হাকীকাতুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যাহ
- হুকমু ইসতিখদামি আসলিহাতিদ দিমারিশ শামিল দিদ্দাল কুফফার
- হুকমুল উতূরাতিল কুহূলিয়্যাহ
- ফিকহু ইবনির রূমী

এ ছাড়া তিনি আরও অনেক উপকারী রচনা ও গ্রন্থ লিখেছেন।

কারাবাস ও বিচার

তিনি ১৪১৫ হিজরিতে গ্রেফতার হন। তাঁকে আল-হাইর কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সাড়ে তিন বছর থাকার পর ১৪১৮ হিজরিতে মুক্তি পান। মুক্তি পাওয়ার পর তিনি ইন্টারনেটে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তবে সময় স্বল্পতার কারণে তিনি

ইন্টারনেটবিমুখ হয়ে যান। তাঁর কাছে আগত মানুষদের সংখ্যা বাড়ছিল। তিনি সবার জন্য আলাদাভাবে সময় করতে পারছিলেন না। তাই প্রতি সপ্তাহের শনি ও মঙ্গলবার মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে তিনি তাঁর বাড়িতে জমায়েতের আয়োজন করতেন। সেখানে বিভিন্ন হাদীস ও (সাম্প্রতিক) ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে আলোচনা হতো। পরবর্তীতে আগতদের উপস্থিতি এত বেড়ে যায় যে, ঘরে তিল ধারণের ঠাঁই থাকত না। তাই তাদেরকে ঘরের ঠিক মাঝখানে শাইখের পাশেই আরেকটি লাইন করতে হতো।

আফগানিস্তানের সাথে আমেরিকার যুদ্ধ দ্বারা আল্লাহ যখন মুসলিমদের পরীক্ষা নিচ্ছিলেন, তখন শাইখ মুমিনদেরকে তাঁদের বিশ্বাসী ভাইদের সমর্থন দিতে ও সহযোগিতা করতে উদ্বুদ্ধ করেন এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে গিয়ে কাফিরদের সাথে মিত্রতা গড়ার ব্যাপারে সতর্ক করেন। তিনি তাঁর অবস্থানে অনড় ছিলেন। ফলে সাউদি সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে। ১৪২৪ হিজরিতে তাঁকে আবার কারাবাসে পাঠানো হয়। তখন থেকে শাইখ নির্জন কারাবাসে আছেন। তাঁকে তাঁর পরিবারের সাথে দেখা করতে বা কথা বলতে দেওয়া হয় না।

আল্লাহর ইচ্ছায় কারাজীবন তাঁর জন্য রহমত হয়ে ওঠে। সেখানে তাঁর ইলমের বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। তিনি নয়টি হাদীস গ্রন্থের হিফজ সম্পন্ন করেন সেখানে। এ ছাড়া অনেকগুলো বই ও মতন মুখস্থ করেন। তিনি মাজমুউল ফাতাওয়া ছয় বার পড়েছেন এবং ৮৫টি নিবন্ধ রচনা করেছেন। এ ছাড়া, তিনি শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ'র উসুলুল ফিকহ ও উসুলুত তাফসীরকে কবিতায় রূপান্তর করেন; যা ছিল ৮০০ লাইনের অধিক।

সম্প্রতি কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া এক ভাই বলেছেন: সেখানকার কিছু সৈন্য শাইখ নাসিরের ব্যাপারে বলে, 'এই লোকের ব্যাপারটা কী? সারাদিনে ৪ ঘণ্টা ঘুমায় আর বাকি সময় পড়াশোনা আর নামাজ আদায় করে কাটায়!'

কারাগারের অবস্থা

শাইখ নাসির আল-ফাহদকে সাউদি সরকার কারাগারে চরম প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন করে। তাঁকে নির্জন কারাবাসে রেখে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করা হয়। অন্যান্য বন্দিদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয় এবং তাঁর সাথে অপমানজনক আচরণ করা হয়। যে ব্যক্তি কুতুবুত তিসআহ (হাদীসের নয়টি কিতাব: বুখারি, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযি ইত্যাদি) মুখস্থ করেছেন, তিনি কি এমন আচরণ পাওয়ার যোগ্য?

তাঁর প্রশংসায় আলিমগণ

আল্লামা হামুদ বিন উকলা আশ-শুয়াইবী রাহিমাহুল্লাহ শাইখ ফাহদের 'আমেরিকানদের সহায়তাকারীর কুফরের প্রমাণ' গ্রন্থটির প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, "আল্লাহ শাইখ নাসির আল-ফাহদকে সফলতা দান করুন, অসংখ্য বরকতময় কাজের অংশীদার তিনি। তিনি সত্য ও এর অনুসারীদের বিজয়ী করতে এবং বাতিল ও তার অনুসারীদের প্রতিহত করতে সরাসরি অংশ নিয়েছেন এবং আপন সময় ব্যয় করেছেন। নানা বই ও প্রবন্ধে তিনি তাদের মোকাবিলা করেছেন। আল্লাহ যেন তাঁকে উত্তম প্রতিদান দেন এবং তাঁকে হকের পথে অটল রাখেন আমরা এ দুআ করি।"

আশ-শুয়াইবীর পুত্র বলেন, "আমাকে কিছু দ্বীনি ভাই বলেছেন, 'যখন দ্বীনি ভাইয়েরা শাইখ হামুদ আশ-শুয়াইবীর কাছে নানা ভ্রান্তি ও অপব্যাখ্যার ব্যাপারে প্রশ্ন নিয়ে আসতেন তখন তিনি জবাব দিতেন : শাইখ নাসির কি এর জবাব দিয়েছেন?'"

শাইখুল মুহাদ্দিস সুলাইমান ইবনু নাসির আল উলওয়ান একই জায়গায় ('আমেরিকানদের সহায়তাকারীর কুফরের প্রমাণ') বলেন, "আল্লাহকে শাইখকে শক্তিদান করুন। যে হাতে তিনি গ্রন্থটি রচনা করেছেন তা কতই না অসাধারণ! আহলুল ইলম ও সত্য-সন্ধানীদের নিকট এটি প্রশংসিত হওয়ার দাবিদার। এটি সেই গ্রন্থ যেখানে হিদায়াতের পথিক ইমাম এবং আহলুল ইলম ও তাকওয়াবানদের অনুসৃত আকীদা ও ফিকহকে সঠিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে।"

তিনি আরও বলেন, "তাঁর মুখস্থশক্তি অত্যন্ত প্রখর। বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁর গভীর জ্ঞান রয়েছে। কারাগারে তাঁর ওপর ব্যাপক যুলুম-নির্যাতন চালানো হয়।"

শাইখুল মুহাদ্দিস আবদুল্লাহ আস-সা'দ বলেন, "আমি শাইখ নাসির আল-ফাহদ রচিত অন্যান্য রচনা দেখেছি। সবগুলোই ছিল কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত ও অত্যন্ত ফায়দাজনক। তিনি সালফে-সালিহীনদের পদরেখা ও পদ্ধতি অনুসরণ করেন। আমরা তাঁকে এমনটাই পেয়েছি। প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহই সু-অবগত।"

মহান আল্লাহ শাইখকে হিফাযত করুন, যালিমের কারাগার থেকে তাঁকে মুক্ত করুন এবং মুসলিমদেরকে তাঁর ইলম থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ করে দিন।[১]

---

[১] আত-তিবইয়ান পাবলিকেশন্স দ্বারা রচিত একটি জীবনী এবং তাঁর পুত্র মুসআব ইবনু নাসির আল-ফাহদ (আল্লাহ তাঁদের উভয়ের মুক্তি ত্বরান্বিত করুন) রচিত জীবনী থেকে সংগৃহীত।

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম।

সকল প্রশংসা আল্লাহর। নামাজ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের ওপর।

সহীহ বুখারিতে আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু'র বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وَاللهِ إِنِّيْ لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً

আল্লাহর শপথ! আমি প্রতিদিন আল্লাহর কাছে ৭০ বারেরও অধিক ইসতিগফার ও তাওবা করে থাকি।[২]

ইমাম মুসলিম আগার আল মুজানি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ

"হে লোকসকল, আল্লাহর কাছে তাওবা করো। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর কাছে দিনে ১০০ বার তাওবা করি।"[৩]

তিরমিযি ও আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন, প্রতিটি মাজলিসে হিসাব করে দেখা গেছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত মাজলিস হতে উঠে যাওয়ার আগে ১০০ বার নিম্নোক্ত দুআটি বলতেন :

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ

"হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার তাওবা গ্রহণ করো।

---

[২] সহীহ বুখারি : ৬৩০৭

[৩] সহীহ মুসলিম : ২৭০২

কারণ, তুমিই তাওবা কবুলকারী, ক্ষমাকারী"।[৪]

এ বিষয়ে অসংখ্য দালিলিক প্রমাণ আছে। রাসূল (সল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হলেন সৃষ্টির সেরা, নবিদের নেতা; আল্লাহ তাঁর পূর্বের ও পরের সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন; অথচ তিনিই ইসতিগফারে[৫] এমন অটল ছিলেন[৬]। তিনি তাঁর উম্মতকেও ইসতিগফারের নির্দেশ দেন; যা প্রমাণ করে, মুমিনদের জন্য ইসতিগফার কত বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই, ইসতিগফার মুমিনের দৈনন্দিন রুটিনের অংশ, যা অবহেলা করা তার শানের সাথে যায় না। ব্যক্তির উচিত যথাসম্ভব ইসতিগফারের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। কারণ, এটিই অন্তরের রোগ, শাহওয়াত ও সংশয়ের সবচেয়ে কার্যকরী ওষুধ। সাধারণ মানুষ, এমনকি অনেক নেককার ব্যক্তিও ইসতিগফারকে কিছু নির্দিষ্ট গুনাহের সাথে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। এর বাইরে তারা অন্যান্য গুনাহের জন্য ইসতিগফার করে না। এর কারণ এটি নয় যে, তারা অন্যান্য বিষয়কে খাটো করে দেখে, বরং তাদের জ্ঞানের অভাব; অথবা বিষয়গুলো তাদের থেকে গোপন থাকার কারণে অথবা সেগুলোর ব্যাপারে গাফিল হওয়ায় তারা ইসতিগফার থেকে বিরত থাকে। আর কোনো ব্যক্তির রোগ সঠিকভাবে নির্ণয় করা না গেলে, তাকে উপযুক্ত চিকিৎসাও দেওয়া সম্ভব হয় না। তখন হয়তো ওষুধটিই তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে, অথচ সে জানবেও না। এ জন্য আমি "ইসতিগফারের কারণ" শিরোনামে সংক্ষিপ্ত এ গ্রন্থটি রচনা করেছি। যেন বান্দা জানতে পারে যে, ইবাদত ও তাকওয়ায় সে যত উঁচু অবস্থানেই পৌঁছে যাক না কেন, পুরো জীবন জুড়ে সকল অবস্থায় সে মারাত্মকভাবে ইসতিগফারের ওপর নির্ভরশীল। আমি আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমার এ কাজে ইখলাস দান করেন এবং এটিকে তাঁর দরবারে কবুল করে নেন। এটিকে মুসলিমদের কল্যাণের ওসীলা বানান।

---

[৪] তিরমিযি : ৩৪৩৪

[৫] আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা।

[৬] মুগীরাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এত অধিক কিয়ামুল লাইল (তাহাজ্জুদ) আদায় করতেন যে, তাঁর পদযুগল ফুলে যেত। তাঁকে বলা হলো, আল্লাহ তো আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের ত্রুটিসমূহ মার্জনা করে দিয়েছেন। তিনি বললেন, আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হব না? [সহীহ বুখারি : ৪৮৩৬]

ইসতিগফারের কারণসমূহ

১. মানুষের সহজাত ঘাটতি

প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ যতটা প্রশংসা বা ইবাদত পাওয়ার যোগ্য; মাখলুকের পক্ষে ততটা প্রশংসা বা ইবাদত করা সম্ভব না। আর যদি (আল্লাহ যতখানি ইবাদতের যোগ্য তা করা) সম্ভবও হতো, তবুও আল্লাহর তাওফীক ব্যতীত তার পক্ষে এটি সম্ভব হতো না। আর, বান্দা যদি তার পুরো জীবন আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যে কাটিয়ে দিত, তবুও সে আল্লাহর প্রাপ্য হক আদায় করতে পারত না। এরপরও বান্দা যে সামান্য নেক আমল করে, আল্লাহ তাতে সন্তুষ্ট থাকেন। এই ইবাদত বান্দার জন্য কঠিন হয় না, তাদেরকে খুব একটা সময়ও ব্যয় করতে হয় না।

সহীহাইনে আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قَالُوا وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ لاَ وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ

তোমাদের কোনো ব্যক্তিকে তার নেক আমল জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না। লোকেরা প্রশ্ন করল : হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকেও নয়? তিনি বললেন : আমাকেও নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ আমাকে তাঁর করুণা ও দয়া দিয়ে আবৃত না করেন।[৭]

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের থেকে পূর্ণ অমুখাপেক্ষী। বান্দার কাছে তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই, বরং বান্দাই সর্বদা তাঁর ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। এরপরও তিনি তাদেরকে প্রচুর নিয়ামত দান করেন, যেমনটি মুসলিমে আবূ যার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَأَزِيدُ وَمَنْ جَاءَ

[৭] সহীহ বুখারি : ৫৬৭৩

بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاؤُهُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطِيئَةً لاَ يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً

আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা বলেন, যে ব্যক্তি কোনো নেক কাজ করবে তার জন্যে রয়েছে দশগুণ প্রতিদান; আর আমি তাকে আরও বৃদ্ধি করে দেব। আর যে ব্যক্তি কোনো খারাপ কর্ম করবে তার প্রতিদান সে কর্মের সমান অথবা আমি তাকে মাফ করে দেব। যে আমার প্রতি এক বিঘত এগিয়ে আসে আমি তার প্রতি এক হাত অগ্রসর হই। আর যে আমার প্রতি এক হাত এগিয়ে আসে আমি তার দিকে দু' হাত (এক গজ) অগ্রসর হই। যে আমার নিকট পায়ে হেঁটে আসে আমি তার প্রতি দৌড়িয়ে আসি। যে আমার সাথে কাউকে শরিক করা ব্যতীত পৃথিবী তুল্য গুনাহ নিয়েও আমার সাথে সাক্ষাৎ করে, তাহলে আমিও তার সাথে পৃথিবী তুল্য ক্ষমা নিয়ে সাক্ষাৎ করি।[৮]

যদিও ইবাদতে বান্দার তেমন একটা সময় ব্যয়িত হয় না; এবং দুনিয়ার বয়সের তুলনায় তার বয়স অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত; এবং আখিরাতের তুলনায় পুরো দুনিয়া চোখের পলকের মতো; এরপরও বান্দা তার ক্ষুদ্র জীবনে যে সামান্য ইবাদত করে, আল্লাহ সেটার জন্য তাকে পুরস্কৃত করেন। এমন পুরস্কার, যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শুনেনি, কোনো মানবহৃদয় কখনো কল্পনাও করেনি। সে জান্নাত এত বিশাল হবে যা আসমান-জমিনের ব্যাপ্তির চেয়েও বিশাল, যে জীবনের কোনো শেষ নেই। সহীহ হাদীসে[৯] এসেছে, জান্নাতের সবচেয়ে কম মর্যাদার ব্যক্তিও দুনিয়ার দশগুণ আয়তনের বৃহৎ জান্নাত লাভ করবে। আমরা এ বিষয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করতে চাচ্ছি না, কেবল বিষয়টি উল্লেখ করাই উদ্দেশ্য। তাই, বান্দা যখন আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে তার ঘাটতি সম্পর্কে জানতে পারে; এবং এই ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও সে কিয়ামত-দিবসে পুরস্কার হিসেবে যা পাবে তা জানতে পারে, তখন তার অন্তরে ইসতিগফার করার তীব্র বাসনা জন্মায়।

২. আমলের ঘাটতি

আল্লাহ তাঁর বান্দাকে যেসব ফরজ আমল, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের আদেশ দিয়েছেন, সেগুলো সম্পর্কে সবাই অবগত। কিন্তু এমন একজন মানুষও পাওয়া যাবে না, যিনি

[৮] সহীহ মুসলিম : ২৬৮৭

[৯] সহীহ মুসলিম : ১৮৬; তিরমিযি : ৩১৯৮

এসব ইবাদত ঠিক সেরূপেই আমল করেন, যেভাবে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমল করতেন। এর কারণ—সামর্থ্যের ঘাটতি, ইলমের কমতি এবং গাফিলতিসহ নানা বিষয়। সুতরাং, বান্দার কোনো ইবাদতই ত্রুটিমুক্ত নয়। ব্যক্তি বিশেষে ত্রুটির পরিমাণ কম-বেশি হতে পারে। সুতরাং, বান্দার ইবাদতে কিছু-না-কিছু ত্রুটি থেকেই যাবে, অথবা ইবাদত পালনের সময় তাতে রিয়া[১০] বা উজব-এর[১১] বিষ প্রবেশ করায় সেটির সওয়াব কমে যাবে। এ কারণে যেকোনো ইবাদতের পর সেটির ত্রুটি পূরণ করার জন্য ইসতিগফারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সহীহ মুসলিমে সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ আদায়ের পর তিনবার ইসতিগফার করতেন।[১২] আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٩﴾

‘অতঃপর তোমরা প্রত্যাবর্তন করো, যেখান থেকে মানুষেরা প্রত্যাবর্তন করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সূরা বাকারা, ২ : ১৯৯]

এবং সহীহাইনে ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু’র সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ বা উমরা থেকে ফিরে আসার সময় বলতেন :

آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ

‘আমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তনকারী, তাঁর কাছেই ক্ষমাপ্রার্থী, তাঁরই ইবাদতকারী, আমরা আমাদের রবের উদ্দেশ্যেই সিজদাকারী, তাঁরই প্রশংসকারী।’[১৩]

আল্লাহ সূরা মুযযাম্মিলের শেষ আয়াতে কিয়ামুল লাইলের ব্যাপারে বলেছেন,

وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

‘আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’ [সূরা মুযযাম্মিল, ৭৩ : ২০]

---

[১০] লোক দেখানো মনোভাব।

[১১] আত্ম-অহংকার, গৌরব থাকা। লেখক এখানে এমন ব্যক্তির কথা বলছেন, যে ইবাদাতের কারণে নিজেকে সম্মানিত ও আত্মগৌরবের দৃষ্টিতে দেখে।

[১২] সহীহ মুসলিম : ৫৯১

[১৩] সুনানু আবী দাউদ : ২৭৭০

আল্লাহ আরও বলেন,

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴿١٧﴾

'...যারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, আনুগত্যশীল ও ব্যয়কারী এবং শেষ রাতে ক্ষমাপ্রার্থনাকারী।' [সূরা আ-লি ইমরান, ৩ : ১৭]

আর (এ আয়াতের ব্যাপারে) কিছু আহলুল ইলম বলেছেন যে, এটি (ইসতিগফার) করতে হবে কিয়ামুল লাইলের পর। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনের—যে জীবন ছিল দাওয়াত, জিহাদ ও কল্যাণে ভরপুর—ইতি ঘটে ইসতিগফারের মাধ্যমে। সহীহ মুসলিমে আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মৃত্যুশয্যায় বারবার এ দুআ পড়েছিলেন :

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

'মহান পবিত্র আল্লাহ। সমস্ত প্রশংসা তাঁর জন্য। আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং তাঁর কাছেই তাওবা করছি।'[১৪]

আর (ইবাদতের পর ইসতিগফার করার) অসংখ্য দলিল আছে। তাই ইবাদতে যে ঘাটতি ও অপূর্ণতা ছিল, আল্লাহর ইচ্ছায় ইসতিগফার বৃদ্ধির দ্বারা সেগুলোর ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করা হয়।

৩. বাহ্যিক পাপ

ইসতিগফারের তৃতীয় কারণ হলো সুপরিচিত বাহ্যিক পাপ ও প্রকাশ্য নিষিদ্ধ কাজসমূহ। যেমন—যিনা, রিবা, চুরি, অন্যের বিরুদ্ধে যুলুম এবং জিহ্বার নানা রোগ যা সৃষ্টির মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে; যেমন মিথ্যা বলা, গিবত করা, অপবাদ দেওয়া, অশ্লীল কথা বলা ইত্যাদি। এ পাপগুলোর ব্যাপারে মানুষ জানে। এগুলো এত পরিচিত পাপ যে, মানুষ মনে করে কেবল এসব পাপের জন্যই ইসতিগফার করতে হয়। ইসতিগফার করার যে আরও অনেক কারণ রয়েছে, সেগুলো তারা জানে না। তাই দেখা যায়, অনেকেই এ পাপগুলো করার পর ইসতিগফার বাড়িয়ে দিলেও, অন্যান্য ক্ষেত্রে ইসতিগফার করার ব্যাপারে সে হয় একেবারেই উদাসীন। অথচ এমনও হতে পারে যে, অন্যান্য ক্ষেত্রেই তার ইসতিগফার করা অধিক জরুরি

[১৪] সহীহ মুসলিম : ৪৮৪

ছিল। আমরা সামনের আলোচনায় এ ব্যাপারে জানতে পারব, ইন-শা-আল্লাহ।

৪. গাফিলতির[১৫] পাপ

ইসতিগফারের চতুর্থ কারণ হলো গাফিলতি বা উদাসীনতায় সংঘটিত পাপ। গাফিলতির পাপ হলো আল্লাহ যেসব কাজের আদেশ করেছেন সেগুলো "পরিত্যাগ করা"। যেমন, বান্দা তার হাত বা জিহ্বা দিয়ে পাপ করার পর তা বুঝতে পারলে আল্লাহর তাওফীকে সে তাওবা করতে সক্ষম হয়। কিন্তু, কখনো কখনো সে এমন পাপ করে যা তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (সরাসরি) করেনি; বরং সে হয়তো আল্লাহর আদেশকৃত কোনো বিধান পরিত্যাগ করেছে। ফলে সে এসব পাপের ব্যাপারে গাফিল থাকে। আর (এসব পাপের) অধিকাংশই অন্যের অধিকার সংক্রান্ত। যেমন : পিতা-মাতার অধিকার, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের অধিকার, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের অধিকার এবং এক মুসলিমের ওপর অন্য মুসলিমের অধিকার ইত্যাদি। এ ছাড়া সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধও এর অন্তর্ভুক্ত। হয়তো কোনো মুসলিম দীর্ঘদিন যাবৎ কোনো একটি নেককাজ থেকে বিরত থাকে, অথবা কোনো পাপকাজ সংঘটিত হতে দেখে (সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হাত বা জিহ্বা দিয়ে) বাধাপ্রদান করে না। এমনকি ক্রমাগত গুনাহের পরিবেশে থেকে সে এতে অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারে। এক পর্যায়ে সে এমন অবস্থায় নেমে যায় যে, গুনাহের ব্যাপারে সে অন্তরে কোনো ঘৃণাও পোষণ করে না। আর এটি দুর্বলতম ঈমান।[১৬] আর এ সকল পাপ তার অজান্তেই তার নামে লেখা হয়। আর এজন্য আল্লাহর ক্রোধ থেকে বাঁচতে ইসতিগফার করা বান্দার জন্য জরুরি হয়ে পড়ে।

---

[১৫] এই পাপগুলো পূর্বে উল্লেখিত পাপের বিপরীত। পূর্বোক্ত তৃতীয় কারণটি হচ্ছে সচেতন অবস্থায় পাপ করা। কিন্তু এ পাপটি আল্লাহ মানুষের ওপর যা আদেশ করেছেন সে বিষয়ে অমনোযোগী হওয়ার কারণে সংঘটিত হয়। এই গুনাহগুলো আগের গুনাহের মতো পরিষ্কার ও প্রকট নয়।

[১৬] আবূ সাঈদ আল খুদরী (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি :

مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَغَيَّرَهُ بِيَدِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَغَيَّرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِلِسَانِهِ فَغَيَّرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোনো মন্দ কাজ দেখতে পায় আর সে তা নিজ হাতে প্রতিহত করে, তবে সে দায়িত্বমুক্ত হলো। যদি তার হাতে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা না থাকে, তাই মুখে এর বিরোধিতা করে, তবে সেও দায়িত্বমুক্ত হলো। আর যে ব্যক্তি মুখে এর বিরোধিতা করার ক্ষমতা না রাখে, আর সে মনে মনে এর বিরুদ্ধাচরণ করে, সেও দায়িত্বমুক্ত হলো; আর এ হলো দুর্বলতর ঈমান। [সুনানুন নাসায়ি : ৫০০৮]

৫. অন্তরের রোগ

এগুলো মূলত অন্তরের রোগ; যেমন অহংকার, উজব, ঔদ্ধত্য, হিংসা, ঘৃণা ইত্যাদি। এ রোগগুলো বাড়তে বাড়তে যেমন (আকারে) পর্বতের মতো বিশাল হতে পারে, তেমনি অণুর মতো ক্ষুদ্রও হতে পারে। সাধারণত অন্তরের এসব রোগ[১৭] থেকে পুরোপুরি মুক্ত থাকা বেশ কঠিন ব্যাপার। এসব পাপের কুপ্রভাব ও ক্ষতি নিম্নরূপ :

১. অনেকে এসব রোগের ব্যাপারে উদাসীন; এমনকি অনেক নেককার[১৮] বান্দাও। যেমন আপনি দেখতে পাবেন, আল্লাহর কোনো কোনো বান্দা দ্বীনের ব্যাপারে বেশ কঠোর—তারা আল্লাহর শরীয়া মেনে চলার চেষ্টা করে, বাহ্যিক গুনাহের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে—কিন্তু তারা হয়তো এক বা একাধিক অন্তরের রোগ দ্বারা পরীক্ষিত হচ্ছে।

২. আল্লাহ কোনো বান্দার অন্তরকে পরিশুদ্ধ না করলে তা সর্বদাই কোনো-না-কোনো অন্তরের রোগে আক্রান্ত থাকে।

৩. অন্তরের রোগ পুরো দেহকে আক্রান্ত করতে পারে। যেমনটি নু'মান ইবনু বাশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "জেনে রেখো, শরীরে এমন একটি গোশতের টুকরো আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীরই ঠিক হয়ে যায়। আর তা খারাপ হলে গোটা শরীরই খারাপ হয়ে যায়। জেনে রেখো, সেটি হলো ক্বলব বা অন্তর।"[১৯]

৪. অন্তরের কিছু রোগ আছে যেগুলো খুব ছোট মনে হলেও এর প্রভাব মারাত্মক হয়। যেমন, অহংকার। সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু'র

---

[১৭] হৃদয় সর্বদা অন্তরের রোগে আক্রান্ত থাকে। হয় সেগুলোকে তাযকিয়াতুন নুফুসের সাহায্যে পরিশুদ্ধ করতে হয়, নয়তো রোগ বাড়তে থাকে।

[১৮] তারা সুস্পষ্ট পাপ থেকে বেঁচে থাকলেও অন্তরের রোগ থেকে পুরোপুরি বাঁচতে পারে না।

[১৯] নু'মান ইবনু বাশীর (রদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি : অর্থাৎ-বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, রাবী বলেন; (এ সময় নু'মান তার আঙ্গুল দুটি দ্বারা কানের দিকে ইশারা করেন, নিশ্চয়ই হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট, আর এ উভয়ের মাঝে রয়েছে সন্দেহজনক বিষয়, অনেক লোকই সেগুলো জানে না। যে ব্যক্তি এসব সন্দেহজনক বিষয় থেকে দূরে থাকে সে তার দ্বীন ও মর্যাদাকে নিরাপদে রাখে, আর যে লোক সন্দেহজনক বিষয়ে পতিত হবে সে হারামের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়বে। যেমন কোনো রাখাল সংরক্ষিত চারণভূমির পাশে পশু চরায়, আশংকা রয়েছে সে পশু তার ভেতরে গিয়ে ঘাস খাবে। সাবধান! প্রত্যেক রাজারই সংরক্ষিত এলাকা থাকে, সাবধান আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা হলো তার হারামকৃত বিষয়গুলো। জেনে, রেখো, দেহের মধ্যে এক টুকরা গোশত আছে। যখন তা সুস্থ থাকে তখন সমস্ত দেহই সুস্থ থাকে। আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায় তখন সমস্ত দেহই নষ্ট হয়ে যায়। স্মরণ রেখো, তা হলো 'ক্বলব' তথা হৃদয়। [সহীহ মুসলিম : ১৫৯৯]